উপাচার্যদের নিয়োগ ও তাঁদের নিয়তি

সৈয়দ আবুল মকসুদ

১২ নভেম্বর ২০১৯, ১২:০২
আপডেট: ১২ নভেম্বর ২০১৯, ১২:০৪

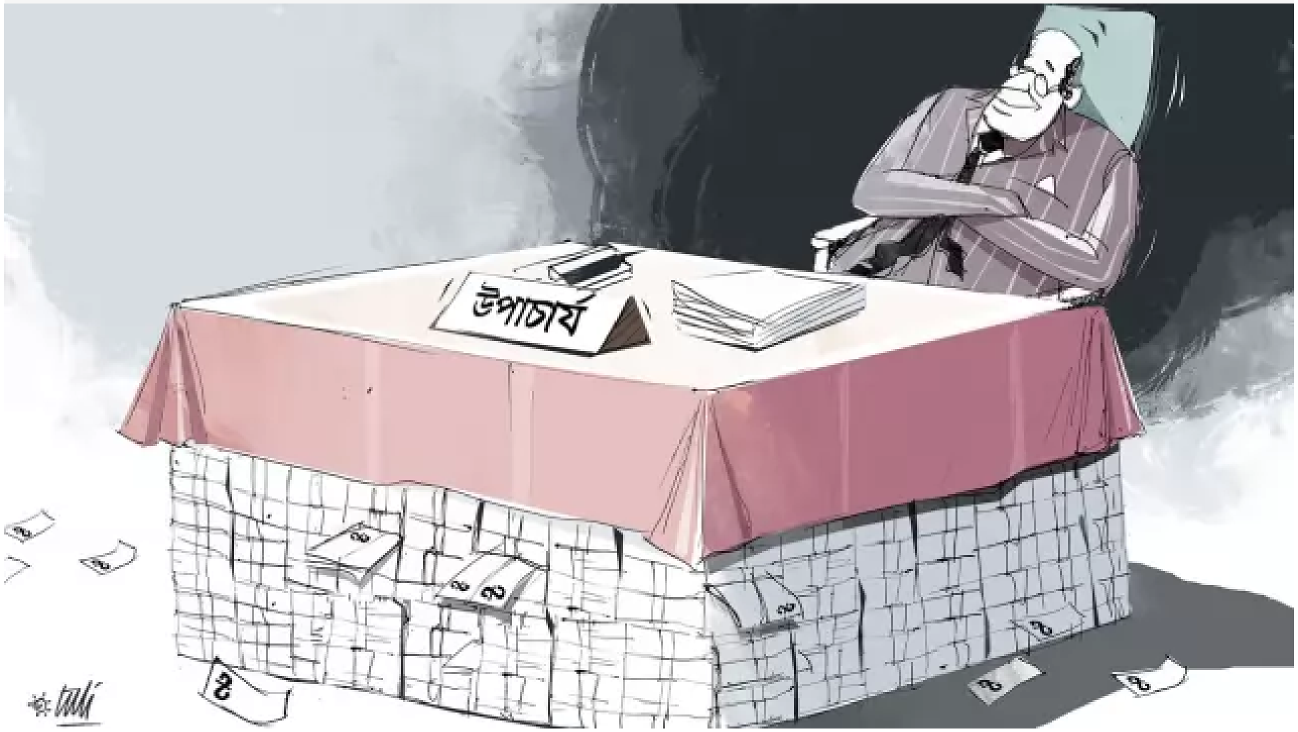

গত চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার গবেষকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। শুধু সাক্ষরতা নয়, শিক্ষিতের হারও বেড়েছে প্রত্যাশামতো, কিন্তু উচ্চশিক্ষার মান নিম্নগামী। দেশজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। তাতে শিক্ষার্থীর কমতি নেই, যোগ্য শিক্ষকের অভাব অবিশ্বাস্য রকম। তার ওপর অধিকাংশ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে সীমাহীন নৈরাজ্য। অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এমন সব অনাচারে জর্জরিত, যা দূর করা বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রায় অসম্ভব।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অধিকর্তা তার উপাচার্য। প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক দুটি দায়িত্বই তাঁকে নির্বাহ করতে হয়। অতি যোগ্য ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কেউ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি যেমন-তেমন ব্যক্তির জন্য নয়। শুধু বড় বড় ডিগ্রিই ওই পদের প্রধান যোগ্যতা নয়, তাঁর সততা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা অবশ্যই থাকতে হবে। শুধু ডিগ্রিটাই যে প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়, তার দৃষ্টান্ত রয়েছে উপমহাদেশের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে। স্যার আজিজুল হক দুই মেয়াদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি ছিলেন বিএ, বিএল পাস উকিল। তা-ও হাইকোর্টের নয়, কৃষ্ণনগর জেলা কোর্টের। ১৯৩৮ সালে তিনি যখন উপাচার্য নিযুক্ত হন, তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি উচ্চশিক্ষিত ও খ্যাতিমান বহু প্রফেসর ছিলেন। আজিজুল হক ছিলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কিন্তু ছিলেন সততা ও নিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা। পুত্র রথীন্দ্রনাথের সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথও তাঁকে স্নেহ ও সমীহ করতেন।

একটি রাষ্ট্রে বহু বড় বড় পদ রয়েছে। অনেক পদের ক্ষমতা বিপুল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটির মর্যাদা অন্য কারও সঙ্গে তুলনীয় নয়। তিনি যাঁদের প্রশাসক ও অধিকর্তা, তাঁরা সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিতদের অন্তর্গত। তাঁরা জ্ঞানজগতের মানুষ। তাঁর প্রতিষ্ঠানের যাঁরা শিক্ষার্থী, তাঁরা বয়সে নবীন হলেও শিক্ষিত ও সমাজের সচেতন শ্রেণি। তাঁরা উচ্চশিক্ষার আগ্রহ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। বয়সে কম হলেও ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষমতা তাঁদের

সমাজের সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি। তার বাইরে তারুণ্যের কারণে তাঁরা ধারণ করেন প্রতিবাদী চেতনা। নিজেদের প্রতিষ্ঠানের হোক, সমাজের কোথাও হোক বা রাষ্ট্রে হোক–কোনো অন্যায় চোখে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেন না। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চরিত্রই প্রথাবিরোধিতা।

উপাচার্যকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গেলে সবাইকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় না। তবে যদি তিনি ন্যায়নিষ্ঠ হন, তাঁর কোনো সিদ্ধান্ত কারও অপছন্দ হলেও অথবা কারও বিরুদ্ধে গেলেও তা মেনে নেন।

প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বহু বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন। পঞ্চাশের দশকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁকে বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিয়োগ দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কয়েক বছর পর তিনি মারা যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বই লিখতে গিয়ে আমি তাঁর কিছু লেখার খোঁজ করছিলাম। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রধান গ্রন্থাগারিক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফেসর বোসের পরিবারের একজনের সন্ধান দেন। শিল্পী কালাম মাহমুদ ও আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। নানা কথার মধ্যে তিনি বলেন, সত্যেন বোস বলতেন, ‘ঢাকার মানুষ থেকে এত ভালোবাসা পেলাম, বিশ্বভারতীতে এসে হলাম অনেকের বিরাগভাজন।’ বহু গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, কিন্তু বিশ্বভারতীর উপাচার্যের চাকরিটি ছিল তাঁর সবচেয়ে অশান্তির।

শুধু সত্যেন বোস নন, বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছয় বছরের জন্য উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। মৃদু কোলাহল শুরু হতেই যখন টের পান, তিনি অনেকের কাছে কাম্য নন, দুই বছর পর পদত্যাগ করেন। কৃষিবিজ্ঞানী এবং নানা গুণে গুণান্বিত ছিলেন রথীন্দ্রনাথ এবং ছিলেন তুলনাহীন ভালো মানুষ। সরকারি কর্মকর্তাদের খবরদারি মেনে নেওয়ার পাত্র ছিলেন না তিনি। বিশ্বভারতীর বিশৃঙ্খলা ছিল তাঁর কাছে অসহ্য। পদত্যাগ করে স্ত্রীকে নিয়ে পিতার প্রিয় জায়গাটি থেকে দূরদেশে চলে যান। সব বাঙালির পক্ষে পদত্যাগ করা সম্ভব নয়। অনেকের কাছেই পদত্যাগ প্রাণত্যাগের সমান। তবে বাঙালির অন্যকে অপমান করার প্রতিভা অপার। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে রথীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠিটি পর্যন্ত দেয়নি। সেটাই ছিল কবিপুত্রের সবচেয়ে বড় ব্যথা। সেই ব্যথা পাওয়ার অল্প দিন পরই তিনি মারা যান।

বাংলাদেশ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সয়লাব। ঢাকার এক বর্গকিলোমিটারে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১০০ বছর আগে বাংলাদেশে যত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল, আজ বিশ্ববিদ্যালয় তার চেয়ে বেশি। শ দেড়েক যোগ্য উপাচার্য খুঁজে পাওয়া

প্রায় অসম্ভব। কিন্তু পদ খালি রাখা যায় না। কাউকে না কাউকে পদে বসাতেই হয়। অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এমন হয়েছে যে ক্যাম্পাস দেশের যেখানেই হোক, উপাচার্য মহোদয় সপরিবার বাস করেন ঢাকায় বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে। অবসরমতো তিনি ৫-১০ দিন পরপর ক্যাম্পাসে যান। কিছু কাগজপত্র সই করে সন্ধ্যায় ঢাকায় ফিরে আসেন।

কোনো রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানই অন্তর্যামী নন। যাঁকে তাঁরা উপাচার্য নিয়োগ দিলেন, কেনাকাটার ব্যাপারে তাঁর মনে কী আছে, তা তাঁরা আগাম কী করে জানবেন? মোটাতাজা একটা মোরগ যদি তিনি আট-নয় শ টাকা দিয়ে কেনেন, বলার কী আছে। ঘন ঘন মিটিংয়ে জনপ্রতি নাশতায় যদি হাজার দেড়েক টাকা খরচা হয়, আপত্তি কোথায়? দেড় হাজার কোটি টাকার কেনাকাটায় ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে না তো কি দেড় শ টাকার বিলে কমিশন খাবেন?

ছাত্রসমাজ সব দেশেই প্রতিবাদী হয়ে থাকে। তারা অন্যায় ও অবিচার চোখ বন্ধ করে সহ্য করে না। কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশে উপাচার্যের দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবাদের ঘটনা বিরল। বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সময়ে উপাচার্যদের দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবাদের ঘটনা অব্যাহতভাবে ঘটছে।

পত্রপত্রিকার খবর যদি অসত্য বা বানোয়াট না হয়ে থাকে, তাহলে দেখা যায়, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের কাজে যোগদানের পর প্রথম ও প্রধান কাজ বিভিন্ন পদে প্রয়োজনের বেশিসংখ্যক নিয়োগ দেওয়া। শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া একজন উপাচার্যের দায়িত্ব। সে পদ চতুর্থ শ্রেণির হতে পারে, প্রফেসর হতে পারে। বিভিন্ন দ্রব্য বেচাকেনায় বাণিজ্য করবেন অন্য শ্রেণির ব্যবসায়ীরা—উপাচার্য নন। কিন্তু এখন নিয়োগ-বাণিজ্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন অনেক উপাচার্য। যত যোগ্যই হোক, নিজের পুত্র-কন্যা, শালা-শালী বা তাঁদের ছেলেমেয়েদের দ্রুততম সময়ে চাকরি দেওয়া অতি নিম্নমানের স্বজনপ্রীতি।

গোপালগঞ্জের উপাচার্য অতি অসম্মানজনকভাবে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তা ক্ষমাহীন এবং ওই পদের মানুষের জন্য লজ্জাকর। জাহাঙ্গীরনগরে গত সেপ্টেম্বর থেকে ছাত্র-শিক্ষকেরা আন্দোলন করছেন। জাহাঙ্গীরনগর ১৯৭৪-এর আইনের অধীন। আন্দোলন এত দিন গড়ানো অনভিপ্রেত। রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানই, তা সে যতই স্বায়ত্তশাসিত হোক, সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত হতে পারত। ইউজিসি উদ্যোগ নিতে পারত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পারত। তারা ব্যর্থ হলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হস্তক্ষেপ করে নিরপেক্ষ তদন্ত করে একটা

সিদ্ধান্ত নিলে এই অচলাবস্থা হতো না। এর আগে জাহাঙ্গীরনগরের ১০ জন উপাচার্যের মধ্যে ৮ জনই আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ও উপাচার্য অবিচ্ছেদ্য। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি-অবনতি উপাচার্যের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছেলেমেয়েরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে আসেন। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য মেধাবীতর শিক্ষক হলে সোনায় সোহাগা। উল্টোটা হলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বড় ক্ষতি। তাঁদের ব্যক্তিগত ক্ষতির চেয়ে বেশি ক্ষতি দেশের।

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের কর্মকাণ্ডের কারণে দেশের ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমস্যাটা উপাচার্য নিয়োগের মধ্যেই নিহিত। জ্ঞানের জগতে যোগ্যতার চেয়ে দলীয় আনুগত্য বড় হওয়া একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখার মান নিচে নামার ফলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র চালানোর মতো যোগ্য মানুষ পাওয়া যাবে না। তাতে রাষ্ট্র ফ্ল্যাজাইল বা নাজুক হয়ে পড়বে। শুধু প্রশাসন নয়, জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে ধস নামবে।

ইউজিসির কাজ ইউজিসি করুক। তার বাইরে সরকারের উচিত হবে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সাবেক ও বর্তমান খ্যাতনামা শিক্ষাবিদদের পরামর্শ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক